The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 1-24, ISSN 2306-3920

আত্মসত্তা, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক মূল্য

মূল : মো. মুনির হোসেন তালুকদার
অনুবাদ : মোহাম্মদ উল্লাহ*

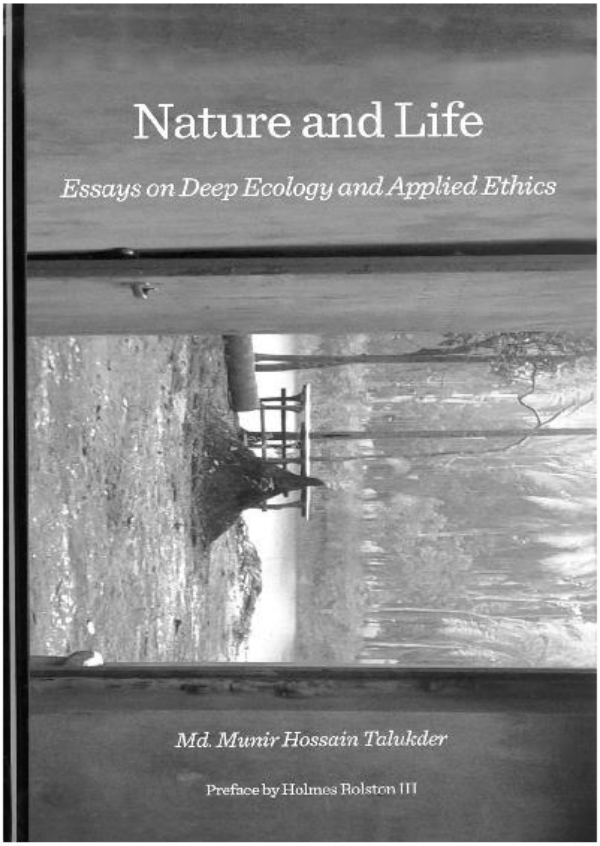

* **মোহাম্মদ উল্লাহ :** সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের ভূমিকা

মুনির তালুকদার কর্তৃক রচিত প্রবন্ধটি প্রথম ২০১০ সালে রোমানিয়া থেকে প্রকাশিত হয় "Self, Nature, and Cultural Values" শিরোনামে *CULTURA: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology* জার্নালের দ্বিতীয় সংখ্যায়। প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইতালিয়ান একজন কবি কর্তৃক প্রবন্ধটি ইতালিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়। ২০১২ সালে ইতালির সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল *PROMETEO* প্রবন্ধটির অনুবাদ UNA NUOVA "FILOSOFIA" AMBIENTALE *Occorre ripensare il rapporto fra se e natura basandosi su valori culturali comuni* [A New Environmental "Philosophy"] শিরোনামে প্রকাশ করে। ২০১৫ সালে সুইডেনের Blekinge Institute of Technology, Karlskrona'র Master Program in Sustainable Urban Planning এর অভিসন্দর্ভ Resilient landscape, resilient culture এ ব্যাপক ভাবে উদ্ধৃত হয়। পরবর্তী কালে তার্কিশ ভাষায় এর সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয়। ২০১৮ সালে *Nature and Life: Essays on Deep Ecology and Applied Ethics* শিরোনামে Cambridge Scholars Publishing, UK প্রবন্ধকারের একটি বই প্রকাশ করে যেখানে এই প্রবন্ধটি "Self, Nature, and Cultural Values" শিরোনামে উক্ত বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় হিসেবে সন্নিবেশিত হয়। আত্মসত্তা, প্রকৃতি, পরিবেশ, সংস্কৃতি, মানুষ ও জীবনের আন্তঃসম্পর্কের গভীরতর উপলব্ধি প্রবন্ধকারকে প্রখ্যাত দার্শনিকদের কাতারে শামিল করেছে। একজন পরিবেশ দার্শনিক, একজন গভীর বাস্তবিদ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিক হিসেবে আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিমণ্ডল তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। উক্ত বইয়ের ভূমিকায় পরিবেশ দর্শনের জনক হোমস্ রলস্টন বলেন, "মুনির তালুকদার বাংলাদেশের একজন পরিবেশ দার্শনিক। সাধারণভাবে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দিক থেকে কম উন্নয়নশীল অনেক দেশের মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত, তাই উন্নত পাশ্চাত্যে আমাদের মত যারা তারা হয়তো আশা করেন না এমন একটা জাতি থেকে এমন একজন পরিবেশ দার্শনিক গভীর বাস্তবিদ (deep ecologist) হিসেবে আর্বিভূত হবেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও তিনি সেদেশে একজন পরিবেশ দার্শনিক ও গভীর বাস্তবিদ এটাই বাস্তবতা" (preface, p.vii, 2018)। অন্যদিকে বহুসংস্কৃতিবাদ বিষয়ে তার সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ভৌগোলিক সীমাতিক্রম করে যে মানুষ ও সংস্কৃতি সে বিষয়ে ভাবতে তাকে প্রবৃত্ত করেছে। ফলে তিনি বহুসংস্কৃতিবাদের (multiculturalism) ত্রুটি চিহ্নিত করে বিকল্প হিসেবে "ভূ-সাংস্কৃতিক অভিন্নতা" (Geo-Cultural Identity) তত্ত্ব প্রদান করেছেন। সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর এই তত্ত্ব ইতোমধ্যে গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিক হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৫ সালে কানাডার লাভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এই তত্ত্বের আলোকে সঙ্গীতবিদ্যায় Country Music's "Hurtin' Albertan": Corb Lund and the Construction of "Geo-Cultural" Identity শিরোনামে পিএইচ.ডি.

গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এটা যেমন আনন্দময় ও আশার আলোর ঝলকানি ঠিক তেমনি বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত এসব চিন্তা প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় অনূদিত হোক তা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় প্রয়োজনের অংশ বলেই মনে হয়। প্রয়োজনের এ তাগিদেই অনুবাদের এই প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টার অনিচ্ছাকৃত যে কোন ত্রুটিতে সবিনয় ক্ষমার আর্জি।

আত্মসত্তা, প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক মূল্য

বাস্তবিদ্যক সংকট একবিংশ শতাব্দীর বড় সমস্যাবলির মধ্যে অন্যতম একটি । ইতোমধ্যেই যে বাস্তবিদ্যক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা আশংকাজনক, মানবসত্তাসহ অন্যান্য প্রজাতিসমূহ জীবন ধারণের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। মিশ্র-সাংস্কৃতিক (cross-cultural) বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এই বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে একটি ফলপ্রদ পন্থা হতে পারে। প্রত্যেক সংস্কৃতিই এই বিষয়ে কিছু মৌলিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন এগুলোকে আবিষ্কার করে স্বীকৃতি দেয়া এবং বিবেচনা করা। সংস্কৃতিসমূহের মধ্যকার একটি তুলনা আমাদের অধিকতর আলোকিত করে, যেহেতু তা আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধকে জানতে ও সংশোধন করতে আমাদেরকে অনুমোদন করে। আত্মসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক ইতিহাস-পূর্ব, যেহেতু সভ্যতা শুরুর আগেই তা অস্তিত্বশীল ছিল। যাইহোক নিত্যনতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি এই সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং, ফলস্বরূপ, অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে। এই অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যুক্ত করে আত্মসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি যুক্তি দেয় যে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলতে সাধারণ (common) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ "অবিচ্ছিন্নতাবোধ" (identification) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভূমিকা

বাস্তবিদ্যক সমস্যাসমূহ, যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র বিলোপ, বৃক্ষনিধন, ওজনস্তর ক্ষয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির বাস্তুতন্ত্রের উপর এক বিরাট প্রভাব রয়েছে, এবং ফলস্বরূপ, প্রজাতিসমূহ, মানব কিংবা অ-মানব, সকলেই হুমকির সম্মুখীন। যেহেতু আমাদের এই গ্রহ বাস্তুতান্ত্রিকভাবে অতিদ্রুত অনুনকূল হচ্ছে, তাই বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, নীতি নির্ধারক, ধর্মীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, এবং এমন কি সাধারণ মানুষও এই সমস্যাবলির আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। যাইহোক বাস্তবিদ্যক সংকটের একটি সমাধান শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত হতে পারেনা।

একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য জানতে হবে আসলে সমস্যাটি কোথায়। পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ধারা, যা মানবকেন্দ্রিক, প্রকৃতির প্রতি আমাদের বর্তমান

প্রবণতাকে আকার প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সম্ভবতঃ এই প্রবণতা অশুদ্ধ। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা রেনে দেকার্ত প্রত্যেক জিনিষকে দেহ এবং মনে বিভক্ত করেছেন। তার মতে, যেহেত প্রকৃতির মন নেই সেহেতু মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়া এর আর কোন মূল্য নেই। শতাব্দীকাল ধরে এইমত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আধিপত্য বজায় রেখেছে। তাই বাস্তুবিদ্যক সংকটের অতিপ্রাথমিক কারণ প্রথিত রয়েছে আত্মসত্তা ও প্রকৃতির সম্পর্কের অধিবিদ্যায়।

নরওয়ের দার্শনিক আর্ন নায়েস কর্তৃক এই অধিবিদ্যক প্রবণতা সংশোধনে ১৯৭৩ সালে প্রথম এবং সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, এবং ব্যাপক ভাবে তা 'গভীর বাস্তুবিদ্যা' (deep ecology) নামে পরিচিত। নায়েসের মতে, প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিক আত্মসত্তা গভীরতর হতে পারে, এরকম একটি আত্মসত্তাকে "বাস্তুবিদ্যক আত্মসত্তা" (ecological self) বলা যায়। তিনি মনে করেন, একটি বাস্তুবিদ্যক সত্তার গভীর অনুভূতি রয়েছে যে প্রকৃতি হচ্ছে একজনের নিজের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ (part of oneself)। যাইহোক, তাঁর বাস্তুবিদ্যক আত্মসত্তা অর্জন ও এর কেন্দ্রীয় পারিপার্শ্বিক ধারণাসমূহ খুবই বিমূর্ত।

সমসাময়িক দুজন পরিবেশ দার্শনিক ইউজেনি সি হারগ্রোভ এবং জে বেয়ার্ড কালিকট, মনে করেন যে পাশ্চাত্য পরিবেশ দর্শন প্রকৃতির প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে "ধনিশ্চিত" (unsure)। তারা যুক্তি দেন যে এ দর্শন একটি পরিবর্তন কালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এশীয় সামগ্রিক প্রবণতা (holistic attitude) বর্তমানের অশুদ্ধ অধিবিদ্যার পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত "সম্ভাবনাময়"। প্রাচ্যের প্রতি এই মোড় নেওয়াটা খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক।

এখানে আমার যুক্তি হচ্ছে:"অবিচ্ছিন্নতাবোধ" একটি সাধারণ পরিবেশগত মূল্য হিসেবে উভয় সংস্কৃতিতেই বিদ্যমান, এবং বাস্তুবিদ্যক সংকট উত্তরণে বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। অধিকন্তু,"অবিচ্ছিন্নতাবোধ" কে মূল্য প্রদান আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে টেকসই সম্পর্ক গঠনে সাহায্য করতে পারে যাতে আমরা একটি সংগতিপূর্ণ সহাবস্থান অর্জন করতে পারি।

পাশ্চাত্য ধারায় আত্মসত্তা ও প্রকৃতি

প্রকৃতিকে আমাদের কীভাবে প্রত্যক্ষণ করা উচিত? আমরা কি প্রকৃতির সাথে বিচ্ছিন্ন নাকি আন্তঃসম্পর্কিত? এই প্রশ্নসমূহ আমরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছি এসব প্রশ্নের মতোই মৌলিক। সকল কালে এবং সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মানুষ এই রহস্যের উত্তর প্রদানে ঐকান্তিক হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে তাদের জীবন যাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষণ রয়েছে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই প্রত্যক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ বিপরীত (উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতির পবিত্রতা), কিন্তু অন্যভাবে,

এমন কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যেগুলো সাধারণ। প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে গ্রিক-রোমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এবং ইহুদি-খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে।

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রকৃতি দেব-দেবীদের রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো যারা কতক মানবীয় গুণাবলিকে ধারণ করতো। গ্রিকরা প্রকৃতির এক শৃংখলায় বিশ্বাস করতো যা নিয়ন্ত্রিত হতো কতক দেব-দেবী কর্তৃক যেমন জিউস, ডেলফি এবং জায়া। এটি বিশ্বাস করা হতো যে, যে সমস্ত লোক জায়াকে সন্তুষ্ট করবে, যিনি সমস্ত দেবতাদের বয়োবৃদ্ধমাতা, তাদের ভাল কর্মকাণ্ডের কারণে তার দয়া প্রাপ্ত হবে, আর যারা তার সাথে যথাযথ আচরণ করবে না তাদেরকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। কিছু প্রাকৃতিক স্থানকে পবিত্র করে রাখা হতো; এবং প্রাচীন গ্রিসে শিকার করাও সীমায়িত ছিল। এমন কি সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকরা মনে করতেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান প্রাকৃতিক বস্তু; যেমন, পানি, আগুন, বাতাস, মাটি ইত্যাদি। কিছু চিন্তাবিদ প্রকৃতির একটি যৌক্তিক ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, নাউস ছিল এনাক্সাগোরাসের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চূড়ান্ত শক্তি। এইভাবে সক্রেটিসপূর্ব প্রকৃতির ধারণা ছিল একত্ব এবং বিশ্বতাত্ত্বিক ঐক্য।

যাইহোক, প্লেটো পরিবেশগত সচেতনতা এবং বাস্তবিদ্যক সংগতির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বৃক্ষনিধনকে রক্ত-মাংসবিহীন একটি মানব কঙ্কাল হিসেবে তুলনা করেছেন। তাই, তিনি তার *লজ* গ্রন্থে পরিবেশগত বিধানাবলি প্রস্তাব করেছেন; যেমন: "যেসব ছাগল ছোট গাছ খেয়ে ফেলে, সেগুলোকে রাখালদের নজরে রাখতে হবে (639a); জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ বনপাল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে (849d)। আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবেনা (843e)" (Hughes 2009, 356)। বিপরীত পক্ষে, এরিস্টটল প্রকৃতির এক সমন্বিতনীতি (unified principle) আবিষ্কার করেছেন; যা উদ্দেশ্যবাদীনীতি (principle of telos) হিসেবে পরিচিত। উদ্দেশ্যবাদীনীতি অনুসারে সমস্ত জীব এবং অজীব উপাদানসমূহের অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য (purpose) আছে।

কিন্তু এরিস্টটল এই কথা বলে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন "উদ্ভিদসমূহ অস্তিত্বশীল প্রাণীদের জন্য... আর সকল প্রাণী অস্তিত্বশীল মানুষের জন্য... এটি আবশ্যিকভাবে স্বীকৃত যে প্রকৃতি সকল জিনিসকে বিশেষভাবে মানুষের জন্য তৈরি করেছে" (Des Jardins 1997, 91)। এই মত প্রভাব বিস্তার করে, যদিও তিনি তার *মেটাফিজিক্স* নামক গ্রন্থে (107a, 17-20) বলেছেন "সকল জিনিস কোনভাবে একত্রে বিন্যস্ত, কিন্তু সকল জিনিস একইরকম নয়–মাছ, পাখি, উদ্ভিদ এবং পৃথিবী একরকম নয় যে এক জিনিসের সাথে আরেক জিনিসের কোন কিছু করার নেই; বরং এগুলো সম্পর্কযুক্ত" (Hughes 2009, 357)। তাই এরিস্টটল পরিষ্কাররূপে মানবসত্তা, প্রাণী,

উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীব ও অজীব উপাদান সমূহের মধ্যে সমন্বিতনীতি (principle of integrity) প্রস্তাব করেছেন।

জড়বাদী দার্শনিকবৃন্দ, যেমন লিউছিপ্পাস, এপিকিউরাস এবং ডেমোক্রিটাস, প্রকৃতির বিশুদ্ধ পরমাণুবাদী যান্ত্রিক মত উল্লেখ করেছেন। যদিও তাদের মত সুখবাদী, তবু তারা মনে করতেন যে মানব কর্মকাণ্ডই প্রাকৃতিক ধ্বংসের কারণ। পরবর্তী কালে, মধ্যযুগে, দর্শন খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে মিশ্রিত হয় এবং সমন্বয়ী রূপ লাভ করে। ফলে, প্রকৃতিকে বাইবেলের আলোকে বর্ণিত করা হয়। *জেনেসিসে* ঈশ্বর বলেন,

> আমার নিজের সুরতে মানুষ সৃষ্টি করা যাক, ঠিক আমার নিজের সাদৃশ্যতায়, এবং তারা সাগরের মাছ, স্বর্গের পাখি, পশু, সকল বণ্যপ্রাণী এবং সরীসৃপ যারা বুকের উপর ভর করে জমিনে চলাচল করে তাদের মনিব হয়ে যাক (1:26)।

ঈশ্বর আরো বলেন, "ফলদায়ক হও, বহুগুণে বৃদ্ধি কর, পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তোল এবং একে জয় কর। সাগরের মাছ, আকাশের পাখি, জমিনের সকল জীব-প্রাণীর মালিক হয়ে যাও (1:28)"(*Genesis*)। থমাস একুইনাস ঈশ্বরের এই মনোভাবের প্রয়োগ ঘটান তাঁর *সামা কন্ট্রা জেন্টাইলসে* এবং যুক্তি দেন যে,

> তাদের ভ্রান্তিকে আমরা খণ্ডন করি যারা দাবী করে যে পশু প্রাণীকে হত্যা করা পাপ। কারণ, স্বর্গীয় বিধানানুসারে, বস্তুর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় প্রাণীরা মানুষের ব্যবহারের জন্য আদেশপ্রাপ্ত। যার ফলে, কোন অন্যায়হীনভাবে মানুষ তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে। (Des Jardins 1997, 92)।

এইভাবে একুইনাস মনে করেন যে অন্যান্য সৃষ্টির উপর মানব সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং, এই কারণে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণী হত্যা করা নৈতিকভাবে ভূল নয়। যাইহোক, এটফিল্ড দাবী করেন যে একুইনাস প্রাণীর কষ্টকে বিবেচনা করেছেন, এবং তাদের অপব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি যুক্তি দেন যে "একুইনাস তারপর সে সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ দেন যে মানুষ এবং 'অন্য প্রাণীর' অনুভূতি প্রাণীদেরকে কষ্ট না দিতে ধর্মীয় বিধানের প্রতি যুক্তি দাঁড় করায়, এবং অমানব প্রাণীসহ অন্যান্য প্রাণীর কষ্টের প্রতি মমত্ববোধের প্রাকৃতিকতাকে (naturalness) স্বীকৃতি দেয়" (Attfield 1983, 208)।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে: প্রথমত; যা প্রাচীনযুগের মত নয়, ঈশ্বর এবং প্রকৃতি আলাদা; এবং দ্বিতীয়ত: প্রকৃতি পবিত্র, এই মত এখানে প্রত্যাখ্যাত। আধুনিক চিন্তাবিদদের উপরে এই দুই মতের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, যারা যুক্তি দেন যে "প্রকৃতি ছিল অন্য জিনিস, ঈশ্বর ছিল আলাদা। আমি আগে

থেকেই বলে আসছি, এই বোঝাপড়া, পাশ্চাত্যের প্রবণতা নির্ধারণে মৌলিক গুরুত্বের ছিল (Passmore 1980, 11-12)। আমার কাছে মনে হয় যে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি দুটি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও এখনো সেখানে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা বিদ্যমান। ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং খ্রিস্টীয় তত্ত্বানুসারে, প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছিলো মানুষের কল্যাণে, তারা ঈশ্বর কর্তৃক প্রকৃতির উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু এই আধিপত্য প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রতিফলিত করে। এটফিল্ডের পর্যবেক্ষেণ হচ্ছে এই যুগ "ঈশ্বরের মহিমা অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবর্ধনের" উপর কেন্দ্রীভূত "মানুষের প্রয়োজন বিবেচনাহীন ভাবেই" (Attfield 1983, 211)।

একটি বৃহত্তর কর্তৃত্বের ধারণার চাইতে ইউরোপীয় আলোকবর্তিকা এবং বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করাতেই আধুনিক যুগের ঝোঁক বেশি। এ যুগের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানবসত্তার সামর্থ্য ও সক্ষমতা রয়েছে, তাদের ইচ্ছামত একে রূপান্তর করার স্বাধীনতা রয়েছে। ফ্রান্সিস বেকন যেকোন মূল্যে মানবজীবনকে আরামদায়ক করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তিনি তার *ধর্মীয় অনুধ্যান* গ্রন্থে দাবী করেন যে, "জ্ঞান স্বয়ং একটি শক্তি" (Passmore 1980, 18)। রেনে দেকার্ত বেকনের মতকে মেনে নেন এবং মানবসত্তাকে "*প্রকৃতির মালিক এবং মনিব*" হিসেবে বিবেচনা করেন" (Passmore 1980, 20)।

দেকার্ত প্রকৃতিতে বিদ্যমান সকল সত্তাকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন: মন এবং দেহ। মনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি, ও সচেতনতা, এবং অনুভব, যেখানে দেহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পদার্থিক এবং যান্ত্রিক। দের্কাত যদিও উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন থাকার মত কে অস্বীকার করেন না, তথাপি তিনি জোরালোভাবে এই বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি প্রদান করেন যে তাদের সচেতনতা রয়েছে। তাই দেকার্তের মতে মানব সত্তা ছাড়া প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি জিনিস শুধুমাত্র যন্ত্র বা "চিন্তাহীন জড়"।

দেকার্তের দেহ-মন দ্বৈতবাদের বিরাট প্রভাব এখনো আধুনিক দার্শনিক চিন্তায় রয়েছে, আর তাই সেই প্রভাব প্রকৃতি বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ প্রদান করেছে। তিনি মানবসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, এমনকি যদিও মানবসত্তাকে দৈহিক ও মানসিক সত্তা হিসেবে দেখা হয়: দৈহিক কারণ মানবসত্তা স্থান দখল করে; এবং মানসিক কারণ তারা তাদের চিন্তা প্রকাশ করতে পারে। এই সূত্র নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে: "একজন ব্যক্তি তার মনের সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়, আর কার্তেসীয় মন অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে মানবমনের সাথে" (Pratt 2009, 365)।

স্পিনোজা কার্তেসিয়ান দেহ-মন দ্বৈতবাদকে এই বলে খারিজ করে দেন যে, কেবল একটি দ্রব্যই আছে: ঈশ্বর। যাইহোক, স্পিনোজার ঈশ্বর ধর্মীয় ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তার ঈশ্বর অব্যক্তিত্বের গুণাবলীকে প্রকাশ করে, যার সীমাহীন গুণ (attributes) আছে, এবং তা প্রকৃতির সাথে অভিন্ন হয়ে প্রত্যক্ষিত হয়। *Deus Sive Natura*: ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিই ঈশ্বর। প্রকৃতি সম্পর্কে স্পিনোজার

অনুধাবনে কোন ক্রমস্তর (hierarchy) নেই; মানবসত্তা, প্রাণীকূল, উদ্ভিদরাজি, সকলই সমানভাবে মূল্যবান কারণ তিনি মনে করেন দৈহিক জগত এবং মানসিক জগত একীভূত। স্পিনোজা লেখেন যে "প্রত্যেক জিনিস যখন তা নিজের মধ্যে থাকে, তার নিজের সত্তাকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায়" (Houle 1997,420)। তাই, স্পিনোজার দর্শন আন্ত-নির্ভরশীলতা, আন্তঃসম্পর্ক এবং একত্বের উপর জোর প্রদান করে।

এই সময়ের দুজন বিখ্যাত দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল এবং ইমানুয়েল কান্ট, মানবসত্তার শ্রেষ্টতর অবস্থানকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিল মানবসত্তার সুখের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, যেখানে কান্ট একটি নীতির জন্য যুক্তি প্রদান করেছেন যা মানুষ এবং বৌদ্ধিক সত্তাকে কখনো শুধু উপায় হিসেবে না নিয়ে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করবে। মিল লেখেন,

> কিন্তু, এটা বলা হয়, এই সমস্ত জিনিষ বিজ্ঞ এবং ভাল লক্ষ্যের জন্য... হয় এটা ঠিক যে আমাদের হত্যা করা উচিত কারণ প্রকৃতি হত্যা করে; নির্যাতন করা উচিত কারণ প্রকৃতি নির্যাতন করে; ধ্বংস এবং বিনাশ করা উচিত কারণ প্রকৃতি এরকম করে; আর না হয় প্রকৃতি যা করে তা কখনোই আমাদের বিবেচনা করা উচিত নয়, কিন্তু যেটা ভাল সেটা করা। (2008, 131)

তাই, এই বক্তব্যে তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞ ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। উপযোগীতায় পরম নৈতিক নীতি, মিলের মতে, যেভাবে তিনি ঘোষণা করেন যে "সকল নৈতিক প্রশ্নের উপযোগীতাকে আমি পরম আবেদন হিসেবে বিবেচনা করি; কিন্তু এটাকে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগ হতে হবে, একটি প্রগতিশীল সত্তা হিসেবে মানুষের স্থায়ী স্বার্থের উপরে ভিত্তি স্থাপিত হতে হবে (p. 31)" (Ten 1991, 212)।

এখনো মিলের 'সর্বাধিক সুখনীতি', যা মানব সত্তার বৃহৎ সংখ্যাকে সর্বাধিক সুখ প্রদানের বিষয়ে প্রধান্য দিয়েছে, তা এতই প্রভাব বিস্তারকারী যে অর্থনৈতিক পলিসি, রাষ্ট্রীয় রাজনীতি, পাবলিক পলিসি, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সকল কিছু গভীরভাবে এর উপর নির্ভর করে। বিপরীতে, কান্টের নৈতিক আইনসমূহ মানবসত্তার পূর্ণ স্বশাসনকে অনুমোদন করে। তিনি মনে করেন যে যেহেতু তারা স্বশাসিত, মানুষ নিজেরাই তাদের উপযোগীতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং তাদের করা উচিত; এই মত বৃহৎ সংখ্যক আধুনিক মানুষদের উৎসাহিত করেছে। বেশি বেশি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যা আরামদায়ক জীবিকাকে সম্ভব করে তুলে তা মানুষকে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে, রূপান্তর করতে, এবং এমনকি প্রকৃতিকে শোষণ করতে উৎসাহিত করেছে। তাই, মানব সুখবৃদ্ধি এবং স্বশাসনের ধারণা আধুনিক যুগে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতকের শুরুতে, প্রকৃতিকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখা হত: জ্বালানীর জন্য মানুষ বন কাটত, পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রনের জন্য ডি ডি টি (DDT) ব্যবহার করত,

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করত, পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করত, ব্রিজ এবং জলাধার নির্মাণ করত, বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য সাগরে ফেলত, এবং মিসাইল পরীক্ষা সম্পন্ন করত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিনিময়ে তারা গ্রহণ করেছে দূষণ, জীবন বিপন্নকারী রোগ. প্রাকৃতিক দূর্যোগ যার মধ্যে আছে ভয়াবহ ভূমিকম্প, ধ্বংসাত্মক বন্যা, এবং ভয়ানক সাইক্লোন, যার ফলে, অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়েছে এবং মানবসত্তা বুঝতে শুরু করেছে যে জলবায়ু পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

প্রাচ্য ধারায় আত্মসত্তা ও প্রকৃতি

প্রাচ্যে, আত্মসত্তা প্রকৃতিকে পবিত্র হিসেবে প্রত্যক্ষিত করে এবং প্রকৃতি এমন একটা আধার যেখানে সকল দেব-দেবীরা থাকে। প্রকৃতি এখানে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়েছে। কিছু প্রাচ্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পাশ্চাত্য থেকে বেশ আলাদা এবং কতক পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা রহস্যজনক মনে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বি. এন. ব্যানার্জি গরু পূজার ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখেন; তিনি বর্ণনা করেন যে "হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের মূলভিত্তিই হচ্ছে আরাধনা, ঈশ্বরভক্তি, প্রেম, অহিংসা, এবং নৈতিকতার প্রাধান্য। পাশ্চাত্যবাসীরা হিন্দুদেরকে উপহাস করে তাদের গরু পূজার জন্য" (Banerjee 1979, 24)। যাইহোক, তিনি আরও বলেন যে এর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ হচ্ছে "প্রাণীর জন্য তাদের ভালবাসার মহৎ প্রকাশ। হিন্দুরা যে পরিবেশে বাস করে সে পরিবেশের প্রতি তারা সচেতন। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের প্রতি তাদের বিশেষ সম্মান রয়েছে। তারা সৃষ্টির বাস্তবিদ্যক ভারসাম্যে বিশ্বাস করে" (Banerjee, 1979, 24)।

মোহান্তি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আত্মসত্তা-প্রকৃতি সম্পর্কের তিনটি নমুনা (model) উপস্হাপন করেছেন: যান্ত্রিক নমুনা, উদ্দেশ্যবাদী নমুনা, বিবর্তন ও কারণিক আবির্ভাব নমুনা । তিনি স্থায়িত্বের বিপরীতে পরিবর্তন এবং নিশ্চলতার বিপরীতে সচলতার উপর ভিত্তি করে এইসব মডেলের কিছু বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। তার বিশ্লেষণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে "যাইহোক, আত্মসত্তা প্রকৃতিতে নেই: এটা এর সম্ভাব্যতার প্রতি জোর দেয় ... চুড়ান্তভাবে প্রকৃতি হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং নৈতিক: দুটি ধারা মিলে যায়। তারপর বিজ্ঞানও আত্মসত্তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি অধীনস্ত হয়" (Mohanty 1992, 222)। তাই, এই পরিপ্রেক্ষিতে, মোহান্তির মন্তব্য প্রমাণ করে যে, আত্মসত্তা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে, ভালত্ব, মহানুভবতা, সৌন্দর্য, এবং সংগতি অর্জিত হতে পারে কেবল আত্মসত্তা ও প্রকৃতির মধ্যকার যথাযথ সম্পর্ক অনুধাবনের মাধ্যমে। এ. কে. ব্যানার্জি আরও স্পষ্ট করে লেখেন যে "তা হচ্ছে বাহ্যত বৈচিত্রময় বিশ্বের আন্তর-

ঐক্যের এবং বিশ্ব-আত্মার সাথে কারো ব্যক্তি-আত্মার আবশ্যিক অবিচ্ছিন্নতার অনুধাবন" (Banerjee, 1979, 233)। [তাহলে] জাগতিক পরিবেশ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে পরিচিত যে কেউ তাদের উপরে জাগতিক পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিতে পারে। সন্দেহাতীতভাবে অল্প কিছু পাশ্চাত্য দেশের মতো, ভারতের ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উচ্চতম মহিমান্বিত; যেমন শাহ ব্যাখ্যা করেন, "তিন দিকে বেষ্টিত স্বর্ণভাণ্ডার রত্নাকরের বেষ্টনী দ্বারা, হিমালয়ের মুকুট পরিহিত, পবিত্র গঙ্গা দ্বারা পানি সিঞ্চিত, যমুনা ... কাশ্মীরের ফলের বাগান দিয়ে বোঝাইকৃত" (Shah 1982, 17)। এমন চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কাউকেই আকর্ষণ করবে, কিন্তু ভারতের জন্য এই আকর্ষণ গভীরতর মূল্যবোধ দাবী করে: আর সে গভীরতর মূল্যবোধ পূর্ণরূপে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তিনটি প্রাচীন পুস্তক ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুপ্রাণিত করে: *বেদ*, *উপনিষদ*, *ভগবদগীতা*। এই পবিত্র গ্রন্থসমূহ কতক বড় দার্শনিক শিক্ষা প্রদানের পথ সুগম করে। উদাহরণস্বরূপ, *ভগবদগীতায়* বর্ণিত যে প্রভু কৃষ্ণ বলেন সত্যিকারের ভক্ত সে যে "আমাকে সকল জিনিসের মধ্যে দেখে, আর সকল জিনিসকে আমার মধ্যে দেখে (6. 30)Ó (Nelson 2008, 99)। এইভাবে, নেলসন যুক্তি দেন, "প্রাকৃতিক বিশ্বের উপাদানসমূহ: সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, সমুদ্র, হিমালয় এবং পবিত্র গঙ্গার সাথে একীভূত করেন" (Nelson 2008, 99)। যার ফলে, প্রকৃতি নিজেই পবিত্র হয়ে উঠে।

প্রকৃতি যেহেতু দেব-দেবী উভয়েরই দেহ, তাই প্রকৃতির সবকিছুই পবিত্র হয়ে উঠে। ল্যাম্ব বর্ণনা করেন,

> প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ, যেমন ফলমূল, ফুল, পত্রপল্লব, শস্যকণা, বাদাম, বেশিরভাগ নদীর পানি এবং এরূপ আরো যা আছে, অন্তর্নিহিতভাবেই বিশুদ্ধ এবং প্রায়ই যে কারো দ্বারাই মন্দিরে নিবেদনের যোগ্য হতে পারে। তাদের আনুষ্ঠানিক বিশুদ্ধকরণের প্রয়োজন হয়না। পবিত্র প্রত্যয়টি পাশ্চাত্য যেভাবে বুঝে থাকে তারা আবশ্যিকভাবে সে অর্থে হয়তো পবিত্র নয় (2004, 345)।

তাই, পাশ্চাত্যধারার আলোচনা থেকে হিন্দুধর্মে "পবিত্রতার" (sacredness) আলাদা একটি অর্থ আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে:

> যদিও এইগুলো [পাশ্চাত্যধারাসমূহ] পবিত্রতাকে বিচ্ছিন্ন, নিশ্চল, সুনির্দিষ্ট, দ্বৈতবাদী, হিসেবে দেখে এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যামূলক চিন্তাক্ষেত্রের অধীন, অধিকাংশ হিন্দুরা একে মনে করেন সর্বব্যাপী, আকারহীন, প্রসঙ্গমূলক, একটি স্তরকৃত বিরামহীনতার উপর অস্তিত্বশীল হিসেবে, এবং কারো পূর্ণ কর্তৃত্বের অধীনে নয় (Lamb 2008, 341)।

ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ সম্মান শুধু প্রাণীদের প্রতিই নয় বরং সমগ্র প্রাকৃতিক জগতের প্রতিই প্রযোজ্য। *উপনিষদ* আত্মসত্তা-প্রকৃতি অধিবিদ্যা আলোচনা করে এবং ঘোষণা করে যে আত্মার বিশুদ্ধতা সংঘটিত হয় পরমসত্তার (*Brahman*) প্রকৃত প্রকৃতি অনুধাবনের মধ্য দিয়ে, এবং এটাই মানবসত্তার মুক্তি (*মোক্ষ*) নিয়ে আসতে পারে। তাই, ভারতীয় ঐতিহ্যে আত্মসত্তা ও প্রকৃতি একটি মৌলিক নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রকাশ করে। গসলিং এ নৈকট্যকে পরীক্ষা করেন এবং লেখেন,

> ইন্দো সভ্যতা অথবা আর্যরা যারা বৈদিক পাঠক্রমের জন্য দায়ী, মানুষ, প্রাকৃতিক জগত এবং অতিপ্রাকৃত সত্তা (ঈশ্বর, দেবতাগণ, একক, ইত্যাদি) এমন আর যা কিছু আছে, এর মধ্যে বিবেচনাযোগ্য নৈকট্য বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ, গাছসমূহকে বিবেচনা করা হয় 'আত্মা দ্বারা পরিবেষ্টিতরূপে' (2001, 32) ।

চিনে প্রকৃতিকে সাধারণভাবে *জিরান* (*ziran*) হিসেবে অনুবাদ করা হয় আক্ষরিকভাবে যা বুঝায় "স্বতঃস্ফূর্ত", অথবা "আত্মসত্তা" (self so)। সমকালীন পরিবেশ দার্শনিক কালিকট লিখেন, "সম্ভবত সবচেয়ে বড় অবদান যা চিরায়ত চৈনিকচিন্তা বৈশ্বিক গভীর বাস্তবিদ্যক সচেতনতার ক্ষেত্রে রাখতে পারে তা নিহিত আছে এই গতিশীলতা, পারস্পরিকভাবে গঠনমূলক ও অন্তরসম্বন্ধের ধারণার উপর" (1987, 85)। চৈনিক বিশ্বতত্ত্বে প্রকৃতি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততার, আধ্যাত্মিকতার এবং ভারসাম্যতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। চৈনিক অধিবিদ্যা উন্নততর গুণাবলী অর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মসত্তার নৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের মত না করে, এই ঐতিহ্য ঘোষণা করে কীভাবে আত্মসত্তা ধর্মীয় উপাখ্যানের উপর নির্ভর করা ছাড়াই সদগুণাবলি সম্পন্ন হতে পারে। কনফুসিয়াস এবং লাও জু বেশ কিছু মহৎ গুণাবলির উল্লেখ করেছেন, যেমন সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা, ভালবাসা, মহানুভবতা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং এরকম আরও অন্যান্য গুণাবলি; যা পরিবেশের একটি সংগতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

কনফুসীয় মূল্যবোধের লক্ষ্য নিহিত আছে মানব প্রকৃতির উন্নয়নে। *রেন* বা মানবতা অর্জনের জন্য একজনকে তার ভেতরের আত্মসত্তাকে উন্নত করতে হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভাল চরিত্র গঠনের মাধ্যমে কেউ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অন্যান্য জিনিসের চেয়ে প্রকৃতির সাথে সংগতির ব্যাপারে অধিক যত্নবান। নেভেলি উল্লেখ করেন যে "একজন বিজ্ঞের 'কর্তব্যপরায়ণ' হওয়ার জন্য, 'জগতের সাথে একই দেহ' হওয়ার জন্য, দাবী করে যে, একদিকে শিক্ষা ও প্রত্যক্ষণের এবং অন্যদিকে, কাছে ও দূরের কর্মের সকল পন্থাসমূহকে সংগতিতে নিয়ে আসার দরকার হবে" (2008, 7)। কিন্তু এই আত্মনিবেদন সহজেই অর্জনযোগ্য নয়; বস্তুত, কনফুসিয়াস মনে করতেন যে একজনকে এটা অর্জনের পূর্বেই একাত্তর বছর

জীবন পার করতে হয়েছে। এখানে আমরা যথার্থ যুক্তি উপস্থাপন করতে পারি যে কনফুসিয়াস প্রকৃতির সাথে মানবাত্মার একটি চলমান এবং দৃঢ় অবিচ্ছিন্নতাবোধের প্রস্তাব করেছেন। প্রখ্যাত কনফুসিয়ান ভাষ্যকার জুন জি (Xunzi) *টিয়েন* বা প্রকৃতি সম্পকে তাঁর লেখায় বলেন, "প্রকৃতি মানবসত্তার সঙ্গে জৈবিক, আবেগিক, এবং ব্যক্তিগত পরিচালনা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত যা গুরুতরভাবে অবহেলিত হয়েছে" (Nelville 2008, 18)। তাই, একটি ভাল জীবনের কনফুসিয়ান সংজ্ঞা প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ যোগাযোগের উপর নির্ভর করে।

দাওয়িজম (Daoism), চৈনিক চিত্রকলা এবং ভূদৃশ্য অঙ্কনের উপর যার গভীর প্রভাব রয়েছে, প্রকৃতিকে স্বতঃস্ফূর্ত হিসেবে দেখে এবং "স্বতঃস্ফূর্ততা" দাওবাদী সংস্কৃতিতে একটি উচ্চমূল্য ধারণ করে। দাওবাদী পণ্ডিত মিলার ব্যাখ্যা করেন যে, "*দাও* হচ্ছে আত্ম-বাস্তবায়নকারী, সৃজনশীল, এবং স্বতঃস্ফূত হওয়া, একইসাথে এই মূল্যগুলো *দাও* ধারায় মৌলিক মূল্য (core-values) হিসেবে চিহ্নিত" (Miller 2003, 140)। কিন্তু প্রকৃতিতে আমরা স্বতঃস্ফূর্ততা কীভাবে অনুধাবন করতে পারি? *দাও* দৃষ্টিভঙ্গিতে এর জবাব হচ্ছে *দাওয়ের* বিকাশের মধ্য দিয়ে। মিলার লেখেন যে "*দাওয়ের* বিকাশ বোঝা যায় সহনশীল সংগতির একটা অবস্থার নির্দেশনায় যা উদ্ভূত হয় মানুষের মাঝে, মানুষ এবং পৃথিবীর মাঝে" (2003,140)।

চৈনিক ধারায় উত্তম আত্মসত্তা হচ্ছে সাধারণ মানবসত্তা যিনি সমগ্র সত্তা দিয়ে একটি মহৎ চরিত্রে রূপান্তরিত এবং রূপায়িত হন" (Fang 1973; 10)। আত্মসত্তা স্রষ্টার এবং দৈনন্দিন ঘটনাবলীর কেবল একজন দর্শক হতে পারেনা। ওয়েইমিংও চৈনিক বিশ্বতত্ত্বের তিনটি মৌলিক প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন: চলমানতা, সমগ্রতা এবং গতিশীলতা। অপরপক্ষে, প্রকৃতি হচ্ছে একটি 'বড় সংগতি', যেখানে অন্য দিকে, এটা গতিশীল, সামগ্রিক এবং সংগতি "স্বতঃস্ফূর্ততা" কে অর্জন করতে পারে। মানবসত্তা, যে প্রকাশিত *চি'ই* (বস্তু/শক্তি) এর মধ্য দিয়ে সংবেদনমূলক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে, তিনি অনুভব করতে পারেন যে "প্রত্যেক জিনিস আমার সঙ্গী", এবং, তাই, তাদেরকে এই জগতের প্রতি অনুগত পুত্র এবং কন্যার মতো বিবেচনা করতে হবে" (Wei-ming 1998, 116)।

চুয়াং জু আত্মসত্তা—প্রকৃতি সম্পর্ককে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন যখন তিনি বলেন," প্রত্যেক জিনিসই তার নিজস্ব সত্তা; প্রত্যেক জিনিসই অন্যকোন কিছুরই অন্য... অন্য উদ্ভূত হয় আত্মসত্তা থেকে, যেমন আত্মসত্তা অন্য থেকে উদ্ভূত হয়। এটাই সেই তত্ত্ব যা আত্মসত্তা ও অন্য একে অপরের উত্থান ঘাঁয়" (De Bary, Chan & Watson 1960, 68)। চুয়াংজুর একজন শিষ্য একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেন "কীভাবে মন নৈতিক নীতিমালার (*Tao*) মাধ্যমে কোন সীমা ব্যতিরেকে বস্তুর ভিতর প্রবেশ করতে পারে?" তিনি উত্তর দিলেন,"মন বৃহৎ কোন অনুভূমিক দরজা নয় যেটা শক্তির

দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বার্থকেন্দ্রীক আকাঙ্ক্ষার বাধাসমূহকে দূর করতে হবে; এবং কেবলমাত্র তারপর এটা বিশুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন এবং সবকিছুকে জানতে সমর্থ হবে" (De Bary, Chan & Watson 1960, 498)।

ধারাসমূহের মধ্যকার বিপত্তিসমূহ

লিন হোয়াইট তার ব্যাপক প্রভাববিস্তারকারী "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" (১৯৬৭), প্রবন্ধে যুক্তি দেন যে বর্তমান বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যাসমূহ প্রকৃতির প্রতি আধিপত্য বিস্তারকারী পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিস্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি মনে করেন,"বিশেষ করে এর পাশ্চাত্য ধারায়, পৃথিবী যা দেখেছে তার মধ্যে খ্রিস্টবাদ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানবকেন্দ্রীক ধর্ম" (White 2008, 18)। হোয়াইট এও মনে করেন যে এমনকি খ্রিস্টবাদ গ্রিক-জার্মান ধারার চাইতেও প্রকৃতির উপর অধিকতর আধিপত্যবাদী। যেমন তিনি বলেন,"উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের অভ্যাস, অনন্তকালীন উন্নতিতে একটা অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয় যা প্রাচ্য কিংবা প্রাচীন গ্রিক-রোমান নিদর্শনেও অপরিচিত ছিল। এটি প্রথিত ইহুদি-খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে, এবং এর ব্যতিক্রম অখণ্ডনযোগ্য" (White 2008, 18)।

জন পাসমোর পরিবেশ নীতিবিদ্যার উপর তার প্রথম আনুষ্ঠানিক পুস্তক, *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Traditions* (1980)-এ একমত পোষণ করেন যে প্রকৃতিতে অনেক বড় বড় পরিবর্তনের জন্য মানবসত্তাই দায়ী। তথাপি তিনি এই অবস্থানের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেন যে প্রকৃতির সাথে একটি উপযুক্ত নৈতিক সম্পর্কের জন্য পাশ্চাত্য ধারাসমূহই পর্যাপ্ত। তাই পাসমোর একটি নতুন নীতিবিদ্যা বা নৈতিক মূলনীতি সূত্রবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার জন্য *জেনেসিস* মানবসত্তাকে শ্রেষ্ঠতর কর্তৃত্ব প্রদান করে; এটা ঠিক, তবে পাসমোর হোয়াইটসের মতকে সংশোধন করেন যে *জেনেসিস* তাদেরকে যত্নশীল হওয়ার জন্যও আদেশ দেয়। পাসমোরের ভাষায়,

> এবং ঈশ্বরও, *জেনেসিস* অনুসারে, মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন: 'ফলদায়ক হও, এবং একে বহুগুণে বৃদ্ধি কর এবং পৃথিবীতে শূন্যস্থানপূরণ কর এবং একে বশীভূত কর' (1:28)। তাই *জেনেসিস* মানুষ যা করে শুধু তাই করতে বলেনা, বরং তাদের কী করা উচিত তা বলে, বহুগুণে বৃদ্ধি করা, শূণ্যস্থানপূরণ করা এবং পৃথিবীকে বশীভূত করা (1980,6)।

এইভাবে, খ্রিস্টবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির জন্য আমাদের দায় হচ্ছে একজন "খামার ব্যবস্হাপক" অথবা "রক্ষকের" মত।

পাসমোর যুক্তি দেন যে এই প্রবণতা "মানুষ হচ্ছে কর্তা এবং প্রকৃতি হচ্ছে তার ব্যবহারের জন্য যন্ত্র" অশুদ্ধ। তথাপি, তার মতে, এই অধিবিদ্যক ধারণা না 'সমগ্র পাশ্চাত্যধারাকে' প্রকাশ করে, না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করার কোন ভিত্তি প্রদান করে। তিনি বরং পাশ্চাত্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে শনাক্ত করেন; সংরক্ষণবাদী (conservationist) এবং পূর্ণতাবাদী (perfectionist), যা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধের কথা বলে। এইভাবে, তিনি মনে করেন যে বাস্তবিদ্যক সমস্যাসমূহের উৎপত্তি পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার কারণে হয়না, বরং মানবসত্তার "অজ্ঞতা", "লোভ" এবং "অদূরদর্শিতার" জন্য হয়ে থাকে। তার ভাষায়, "আমাদের বাস্তবিদ্যক দুর্যোগের বড় উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা ছাড়াও লোভ এবং অদূরদর্শিতা" (Passmore 1980, 187)।

সুতরাং, পাসমোরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে পাশ্চাত্য "অন্যান্য সমাজের চাইতেও অধিক পছন্দসমূহ উন্মুক্ত রেখেছে" এবং (সেখানেই) বাস্তবিদ্যক সমস্যা সমাধানের বীজ নিহিত আছে (1980, 195)। কিন্তু মরমী দৃষ্টিভঙ্গি, "প্রকৃতি পবিত্র", একে পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ তিনি মনে করেন মরমীবাদ একটি সমাধান হতে পারে না। বরং, সমাধান হতে পারে "পুরনো-ধাঁচের প্রক্রিয়া: চিন্তাপূর্ণ কর্ম" (old-fashioned procedure: thoughtful action) ব্যবহার করা।

পাশ্চাত্যে, আত্মসত্তা এবং প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক গতানুগতিকভাবে খ্রিস্টবাদ এবং বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মসত্তাকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখা হয়। বিজ্ঞান এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে ক্ষমতায়ন করেছে। কালিকট মনে করেন যে গ্রিক-রোমান উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (worldview) রূপায়ণের জন্য দায়ী। তার মতে, কোন ধরনের বিচারমূলক এবং পদ্ধতিগত আলোচনা ছাড়াই, গ্রিক দার্শনিকরা ইহুদি-খ্রিস্টীয় শিক্ষাকে উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছেন। গ্রিক পরমাণুবাদ, যা প্রকৃতিকে জড়াত্মক এবং যান্ত্রিক হিসেবে উপস্থাপন করে, তা 'প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' হয়েছে পাশ্চাত্য শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে। দেকার্তের দেহ/মন দ্বৈতবাদ এই পরমাণুবাদী যান্ত্রিক মতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং চূড়ান্তরূপে আত্মসত্তা "আবশ্যিকভাবে এবং নৈতিকভাবে প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে" (Callicott 1987,119)। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি, কালিকট যেমন বলেন, "গ্রিকদের থেকে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতির পরমাণুবাদী/যান্ত্রিক চিত্র, যা চিরায়ত আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে" তাকে উপস্থাপন করে (1987,118)।

এইভাবে প্রায় সকল পরিবেশ দার্শনিকই মনে করেন যে মানবসত্তার উচিত প্রকৃতির সাথে সম্পর্ককে পুনর্বিবেচনা করা। ভয়ংকর প্রাকৃতিক শোষণের কারণে, মানব এবং অ-মানব প্রজাতি উভয়ের জীবন চরম হুমকির সম্মুখীন। যেভাবে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে এবং মানবকেন্দ্রীকতার উপর ভিত্তি করে মূল্যতত্ত্ব নির্মাণ করে, সেখানে প্রাচ্যের-সামগ্রিক পরিবেশ চিন্তার প্রতি ঝোঁকে

যাওয়া সুস্পষ্টরূপেই দৃশ্যমান। এই পরিবর্তনের লক্ষ্য একটি বিশিষ্ট আশায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে "মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করতে এইসব পাশ্চাত্য ব্যাধিসমূহের জন্য প্রাচ্য ধারাসমূহ একটি বিকল্প অধিবিদ্যা এবং মূল্যবিদ্যা প্রদান করতে পারে, যেমন এটি ছিল" (Callicot, 1987,119)।

একটি বিকল্প বাস্তুবিদ্যক মূল্যায়নের জন্য যেখানে এশীয় ধারাসমূহ খুব আশা জাগানিয়া, সেখানে এশীয় দার্শনিকবৃন্দ এখনো একটি সুগঠিত বাস্তুবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রবদ্ধকরণে সফল হননি। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমস্যাবলিকে এখানে উল্লেখ করা যায়: প্রথমত: কীভাবে এই ধারা, মূলত ধর্মীয় এবং ভাববাদী, পরিবেশের প্রায়োগিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে খাপ খাইতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য *বাস্তুবিদ্যক মনিব* দৃষ্টিভঙ্গির মতো, সামগ্রিক এশীয় দৃষ্টিভঙ্গি মানবসত্তাকে *বাস্তুবিদ্যক দাস* হতে আহবান করে; অথবা, বিকল্পভাবে বলা যায়, নীতিবিদ্যার পরিসরের বাইরে, প্রকৃতির সাথে একটি আধিবিদ্যক সামঞ্জস্য নির্মাণ করে থাকে। কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতে, এশীয় ধারাসমূহ মানব-প্রকৃতি সম্পর্কের নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নয়, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, কীভাবে আত্মসত্তার প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাদের কোন প্রায়োগিক উত্তর নেই।

লিন হোয়াইট, যিনি পরিবেশের প্রতি খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দেন, প্রাচ্য বিকল্পকে তিনি উত্থাপন করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে এমন বিকল্প একটি খ্রিষ্টীয় মতের "অতি নিকটবর্তী" এবং এর "টিকে থাকার সামর্থ" হল "সন্দেহজনক"। কিছু বৎসর পর, ১৯৭২ সালে ধর্মতত্ত্ববিদ জন বি কব জুনিয়র ভারতীয় ধারাকে উপেক্ষা করেছেন কারণ তিনি মনে করেছেন যে "ভারতীয়রা মানব জীবনকে খুবই কম সম্মানকারী"। যদিও এই ভারতীয়রা প্রকৃতিকে পবিত্র হিসেবে প্রত্যক্ষণ করে, "তারাও ধ্বংসাত্মক বাস্তুবিদ্যক অনুশীলনের সাথে যুক্ত"। অধিকন্তু, একটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী ভারতীয় জীবনধারায় খাপ খাওয়াতে পারবে না। কবের মতে, অনুরূপভাবে, *তাওবাদ*সহ চিনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ "অ-ফলপ্রসূতা প্রদর্শন করেছে" বাস্তুবিদ্যক ভাবে ধ্বংসাত্মক অনুশীলনসমূহ, যেমন বৃক্ষনিধনকে, প্রতিহত করার ক্ষেত্রে (Hargrove 1989, xv)।

জন পাসমোরের প্রতিক্রিয়া বরং আরও চরম; তিনি উল্লেখ করেন প্রাচ্য হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ভ্রান্তি; পূর্ণরূপে মরমীবাদী, এবং এমন কিছু যা চূড়ান্তভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির "ধ্বংস" ডেকে আনবে (Hargrove 1989, xvi)। যাইহোক, সমসাময়িক পরিবেশ দার্শনিক, তৃতীয় হোমস্ রলস্টন প্রাচ্যকরণের পক্ষে একটি বিচারমূলক এবং উদ্দীপনামূলক যুক্তি দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ "Can the East Help the West to Value Nature?" এ রলস্টন লেখেন, "প্রস্তাবিত প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে প্রাচীন এবং ধর্মীয় উভয়ই। পাশ্চাত্য সমস্যা হলো সাম্প্রতিক এবং বৈজ্ঞানিক" (1987, 172)। তিনি এ বিষয়ে

সচেতন যে প্রাচ্যের ভাষা ও অধিবিদ্যার সাথে পাশ্চাত্যের ভাষা এবং অধিবিদ্যার গুরুতর অমিল রয়েছে। প্রাচ্যবাসীরা কথা বলে ধর্মীয় ভাষায়, যেটি কবিতাকে নীতিবিদ্যার সাথে মিশ্রিত করে। অপরদিকে, পাশ্চাত্যবাসীরা বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার করে যা ধর্ম এবং নীতিবিদ্যাকে পৃথক করে। রলস্টন বলেন যে:

> সম্ভবত তাওবাদীরা ভারসাম্যপূর্ণ একটি জীবনের জন্য বিস্তারিত কাজ করেছেন যা কেবল চৈনিক সমাজের জন্যই প্রযোজ্য ... সম্ভবত অধিক ইন্ এর জন্য আহবান করা এখনো ভালো উপদেশ ... কিন্তু তা কি আধুনিক, শিল্পায়িত, উচ্চপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ পাশ্চাত্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যে করতে পারে? এটি কি পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দিতে পারে কী সংরক্ষণ করতে হবে, কোথায় ছাড় দিতে হবে, উষর জনহীন প্রান্তর সংকোচনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তার কতটুকু সংরক্ষণ করতে হবে? (1987, 181)।

এইভাবে, রলস্টন দাবী করেন যে, পাশ্চাত্যকে সাহায্য করার জন্য প্রাচ্য চিন্তার একটি "বিবেচনাযোগ্য পুনর্গঠন" আবশ্যক ।

একটি সাধারণ মূল্যের স্বীকৃতায়ন

এই সমস্ত বিপত্তি সত্ত্বেও, প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের প্রথম প্রচেষ্টা নেন নরওয়ের দার্শনিক আর্ন নায়েস। তিনি তাঁর গভীর বাস্তুবিদ্যার ভিত-কাঁপানো চিন্তায় একটি ইকোসফির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন যার নাম "ইকোসফি টি" (Ecosophy T)। নায়েসের "ইকোসফি টি" এর একটি চূড়ান্ত আদর্শ আছে আর তা হলো "আত্মোপলব্ধি" (Self-realization)। তিনি লিখেন, "'Ecosophy T'এর আশ্রয়বাক্য / সিদ্ধান্ত সূত্রবদ্ধ করার ক্ষেত্রে 'আত্মোপলব্ধি!' চুড়ান্ত আশ্রয়বাক্য হিসেবে মনোনীত হয়" (Naes 1995, 215)। "সবকিছুই আন্তঃসম্পর্কিত"— এই সূত্রের উপরই নায়েসের আত্মোপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত। নায়েস যুক্তি দেন যে, ব্যক্তি-আত্মা একবার আত্মোপলব্ধি অর্জন করলেই তার আচরণ "প্রাকৃতিকভাবে" এবং "আনন্দিতপূর্ণভাবে" পরিবেশ নীতিবিদ্যার আদর্শকে অনুসরণ করে।

নায়েসের মতে, অবিচ্ছিন্নতাবোধ (identification) আত্মোপলব্ধির প্রক্রিয়া, তদনুযায়ী অনুধাবন হচ্ছে আমরা বৃহত্তর "আত্মা" (Self) এর অংশ। যেমন তিনি বলেন, "আমাদের আত্মা হচ্ছে তাই যার সাথে আমরা অবিচ্ছিন্ন হই" (Naes 2008, 222)। অবিচ্ছিন্নতাবোধের একটি উদাহরণ হচ্ছে একবার নায়েস একটি মুমূর্ষ মক্ষিকা দেখলেন যেটি এসিডের মধ্যে পড়েছিলো। যদিও তিনি মৃত্যু থেকে সে মক্ষিকাকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিলেন না, তবু তিনি এর কষ্ট অনুভব করলেন। নায়েস বলেন, "প্রাকৃতিকভাবে যেটি আমি বোধ করেছিলাম তা ছিল মমতা ও সমবেদনার বোধ" (Naes 1995, 227)। যখন অবিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি একবার

আত্মোপলব্ধি অর্জন করে তারপর তা বাস্তবিদ্যক আত্মায় (ecological self) উন্নীত হতে পারে। উল্লেখ্য, নায়েস 'অবিচ্ছিন্নতাবোধ' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অবিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাটি ধরতে পারা সহজ নয়। যাইহোক, আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত: নায়েস স্বীকৃতি দেন যে আমাদের অ-মানব সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নতার কিছু সম্পর্ক আছে যেগুলো জীবন্ত। তিনি লিখেন, "আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আমাদের বাড়ি, (যেখানে আমরা শিশু হিসেবে থাকি); এবং অমানব জীবিত সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধ, বৃহদাংশে উপেক্ষিত" (Naes 1995, 226)। কিন্তু আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অজীব সত্তার সাথেও অবিচ্ছিন্ন হই। উদাহরণস্বরূপ, সক্রেটিসপূর্ব দার্শনিকরা মনে করতেন যে কিছু প্রাকৃতিক উপাদান যেমন, পানি, বাতাস, আগুন, অথবা মাটি, বিশ্বজগতের মূল উপাদান হতে পারে। একই কথা ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্যও সত্য; ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে তাদের পাঁচটি মূল উপাদানের (*পঞ্চভূত*) ধারণার জোরালো ভূমিকা রয়েছে। এইসব অজীব সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধের শক্তিশালী বন্ধনকে উপেক্ষা করা কঠিন।

দ্বিতীয়ত: নায়েসের মতে অবিচ্ছিন্নতাবোধ 'একটি প্রক্রিয়া'। তিনি এটিকে চূড়ান্ত আদর্শ আত্মোপলব্ধি অর্জনের জন্য একটি পদ্ধতি, একটি হাতিয়ার, একটি পন্থা, অথবা একটি উপায় হিসেবে নিয়েছেন। তিনি বলেন, "আত্মসত্তা সুস্পষ্টকরণের ঝক্কিকে 'অবিচ্ছিন্নতাবোধের' বা 'অবিচ্ছিন্নতাবোধের প্রক্রিয়ার' প্রত্যয় 'আত্মসত্তা' (self) থেকে আলাদা করে ফেলে" (Naes 1995, 227)। তাই অবিচ্ছিন্নতাবোধ নায়েসের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। যাইহোক, যখন প্রাচীন গ্রিকরা জায়াকে, গ্রিক ধারার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধমাতা, সন্তুষ্ট করতে চাইতো, অবিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের জন্য একটি লক্ষ্য ছিল। বেহেস্ত, জমিন, এবং মানবের মধ্যে ভারসাম্য বা সংগতির চৈনিক দৃষ্টিভঙ্গি অবিচ্ছিন্নতাবোধকে লক্ষ্য হিসেবে প্রকাশ করে, উপায় হিসেবে নয়।

তৃতীয়ত: নায়েস লেখেন, "মানুষের মধ্যে সংহতি ও সহানুভূতি হওয়ার জন্য অবশ্যই অবিচ্ছিন্নতাবোধ থাকতে হবে" (Naes 1995, 227)। কিন্তু নায়েস দ্রুতই "সহানুভূতি", "সহমর্মিতা" বা "সংহতিকে" মূল ধারণা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। বরং, তাঁর মতে, এগুলো হলো, অবিচ্ছিন্নতাবোধের মাধ্যম। যাইহোক, প্রাচ্যধারায় আমরা বুদ্ধ এবং গান্ধীকে খুঁজে পাই যাদের দর্শনের মূলে ছিল জীব-অজীব সকলের জন্য সহমর্মিতা অথবা সহানূভুতি। নায়েস নিজে উল্লেখ করেন, "গান্ধী তার আশ্রমে এ জন্য পিছু হটে যেতেন, যাতে সাপ, বিচ্ছু, এবং মাকড়সা বাধাহীনভাবে তাদের শয্যাকক্ষে ঘোরাঘোরি করতে পারে যেভাবে প্রাণীরা তাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে। এমন কি তিনি মানুষদেরকে বিষাক্ত কীটদের দমনের জন্য ঔষধ-ভাণ্ডার রাখতে নিষেধ করেন" (Naes 1995, 233)।

সবশেষে, নায়েস বর্তমান সংরক্ষণবাদী নীতির সমালোচনা করেন যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য মানবসত্তার অস্তিত্বের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা। নায়েস মনে করেন যে উদ্দেশ্য হতে হবে বরং 'আত্মপ্রেম' (self love)। এই প্রেম অবশ্যই 'আত্মকেন্দ্রিক প্রেম' (selfish love) কে বুঝায় না বরং, প্রকৃতিতে সকল উপাদানসমূহের জন্য একটা গভীরতর প্রেম। অবিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্য দিয়ে আমরা প্রেমের এই সক্ষমতা অর্জন করতে পারি, যেমন নায়েস লিখেন, "অবিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পারে যে তাদের নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে সংরক্ষণের দ্বারা, প্রকৃত আত্ম-প্রেমের মধ্য দিয়ে, এমন একটি বৃহত্তর এবং গভীর আত্মার প্রেম" (1995, 229)।

তাই, নায়েসের অবিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা বহু-মাত্রিক। নায়েস একটি পরোক্ষ উপায়ে অবিচ্ছিন্নতাবোধকে মূল্য দিয়েছেন, অথবা আমরা বলতে পারি তার নিকট অবিচ্ছিন্নতাবোধের করণিক (instrumental) মূল্য রয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাংস্কৃতিক ধারায় অবিচ্ছিন্নতাবোধের একটি স্বতঃমূল্য এবং ঐকিক (unified) নিহিতার্থ রয়েছে। নায়েস নিশ্চিতরূপেই এই প্রত্যয় পরিচয় করণের ক্ষেত্রে অগ্রদূত; কিন্তু তিনি কেবল তার বাস্তুদর্শন (ecosophy) নির্মাণের ক্ষেত্রে একে মূল্য দিয়েছেন। যাইহোক, *সাংস্কৃতিক মূল্য* (cultural value) হিসেবে অবিচ্ছিন্নতাবোধের একটি শক্ত শেকড় রয়েছে, যাকে নায়েস উপেক্ষা করেছেন।

কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অবিচ্ছিন্নতাবোধ সাধারণ (common)?

অবিচ্ছিন্নতাবোধ শ্রেষ্ঠতা শনাক্তকরণের একটি *ক্রিয়া*। তবে "শ্রেষ্ঠতা" শব্দটি নিম্নোক্ত যেকোন একটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে: মানবতা, সংগতি, ভারসাম্য, বাস্তবিদ্যক সমাজ, বাস্তবিদ্যক সদগুণ, এবং এরকম আরো যা আছে। অন্য কথায়, এটি এমন একটি ক্রিয়া যা মানবসত্তার শ্রেষ্ঠতর গুণাবলি বিকশিত করে যার মাধ্যমে প্রকৃতিতে তারা তাদের অবস্থান অনুধাবন করতে পারে। 'অবিচ্ছিন্নতার' এই বোধ সমগ্র সাংস্কৃতিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

গ্রিকগণ জায়াকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন হতো। জায়া ছিল গ্রিক দেবতাদের সবচেয়ে প্রবীণ মাতা এবং তিনি আনন্দিত হতেন কেবল প্রকৃতির সাথে ভাল কর্মকাণ্ডে। প্রকৃতির সাথে ভালো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য কেন গ্রিকগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন? একটি বড় কারণ হতে পারে যে লোকেরা জায়ার সাথে অবিচ্ছিন্ন হতো। গ্রিকগণ তাদের বিশ্বজগতের পরমসত্তাকে অনুধাবনের জন্যও প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, থেলিস সর্বত্র পানি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, সকল বস্তুতে পানি উপস্থিত তা অনুধাবনের মাধ্যমে, এবং বিশ্বতাত্ত্বিক একত্ব হিসেবে এর সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন পানি হচ্ছে পরম সত্তা।

মধ্যযুগে, প্রকৃতি পবিত্র, এবং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল এইমত প্রত্যাখ্যাত হয়। মানুষ এই সময়ে একটি করণিক প্রবণতার মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন

হতো। বিকল্পভাবে, প্রকৃতিকেও একটি সুখী জীবন-যাপনের জন্য সম্পদ হিসেবে দেখা হতো, এইভাবে প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব এবং আধিপত্যকে যুক্ত করে। আধুনিক যুগে, অবিচ্ছিন্নতাবোধকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে, দেহ/মন দ্বৈতবাদ বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষেরা প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, স্পিনোজার দৃষ্টিভঙ্গি "ঈশ্বরই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিই ঈশ্বর" এই অবিচ্ছিন্নতাবোধকে আধ্যাত্মিক অভিমুখিনতায় পরিবর্তন করেছে, তাই, আমরা তাকে, অবিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হিসেবে বর্ণনা করতে পারি। মিল ও কান্ট উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকৃতির সাথে একটি পরোক্ষ অবিচ্ছিন্নতাবোধকে উপস্থাপন করে।

এই শতাব্দীতে, অবিচ্ছিন্নতাবোধ ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আর্ন নায়েসের অবিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা একের সাথে একের সম্পর্ককে তাৎপর্যমণ্ডিত করে। এরূপ একটি গভীর অবিচ্ছিন্নতাবোধ ধারণ করে যে প্রকৃতি আমাদের দেহের একটি অংশ। এই অবিচ্ছিন্নতাবোধ সুস্পষ্টরূপেই আত্মসত্তাকে ছাড়িয়ে যায়। যাইহোক, কেউ আবার প্রকৃতিকে তত্ত্বাবধায়করূপে ভাবতে পারেন। অন্য ভাবে বললে, ঈশ্বরের আকৃতিতে আমরা সৃষ্ট, এবং প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধ মানে হচ্ছে আমাদের লোভ, অজ্ঞতা, এবং অদূরদর্শিতাকে দূরীভূত করা। তথাপি; এটি আত্মবিমুখ নয়। জন পাসমোর অবিচ্ছিন্নতাবোধের এই তত্ত্বধায়কের নমুনা মডেল বিকশিত করেছেন।

অবিচ্ছিন্নতাবোধের মূল্য এশীয় ধারায়ও বিদ্যমান। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনিসমূহ মনে করে শিশুরা মায়ের সাথে যেভাবে অবিচ্ছিন্ন ঠিক তেমনি মানবসত্তাও প্রকৃতির সাথে অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছন্নতাবোধ প্রকৃতির জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত বহন করে। সংক্ষেপে, এই অবিচ্ছন্নতাবোধ আমাদেরকে কর্মবাদের কারণে মনে করিয়ে দেয় "তোমার কাজের পূর্বে চিন্তা কর", যা বলে যে আমাদের প্রকৃতির প্রতি ভালো ব্যবহার করা উচিত আর না হলে আমরা ভোগান্তিতে পড়ব। তাই, এখানে প্রেম এবং ত্যাগ অবিচ্ছিন্নতাবোধের উপায়। সাংখ্য ধারা একটি অবিচ্ছিন্নতাবোধ প্রতিষ্ঠা করে, যা মানুষকে কৃপণতা থেকে দূরে রাখে এবং তাদের সঠিক জ্ঞান প্রদান করে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলির অবিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অনুধাবনে সাহায্য করে। অদ্বৈত বেদান্ত (দ্বৈত নয়) অনুসারে, প্রকৃতির সাথে আমাদের অবিচ্ছিন্নতাবোধ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় চেতনা অর্জন করা, মায়া বা ভ্রান্তিকে প্রত্যাখ্যান করা, এবং পরম আত্মাকে (ব্রাহ্মণ) অনুধাবন করা। গান্ধীর অহিংসার সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা একটি অস্বার্থপর মনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর অবিচ্ছিন্নতাবোধের লক্ষ্য নিহিত আছে অন্যদের কষ্ট অনুধাবনের মধ্যে।

চৈনিক ধারায়, অবিচ্ছিন্নতাবোধ হচ্ছে সৃষ্টিপুরাণ ব্যবহার ছাড়াই একটি শ্রেষ্ঠতর অবস্থান অর্জনের একটি পন্থা, কিন্তু মহান প্রেম অথবা যথার্থতার সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধ ছাড়া আত্মার সংগতি অর্জিত হতে পারেনা। প্রজ্ঞাবান মানুষ

সদগুণসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে অবিচ্ছিন্নবোধ করে এবং মহৎ হয়ে ওঠে। কনফুসিয়াস বলেন,"শাসন করা (*cheng*) হচ্ছে ঠিক ঠিক বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা, তুমি যদি নিজেকে সঠিক বানানোর মাধ্যমে শুরু কর কে সাহস করবে তোমাকে সঠিক থেকে বিচ্যুত করতে (xii: 17)।" (De Bary, Chan & Watson 1960, 32)। অনুরূপ, লাউ জু এর দৃষ্টিভঙ্গিতে, *দাও*য়ের প্রতি আমাদের অবিচ্ছিন্নতাবোধই কেবল আমাদেরকে বলতে পারে কীভাবে "প্রকৃতি অনুসারে" কাজ করতে হয়। *দাও দে জিং*য়ে (*Daodejing*) তিনি বলেন,

> *দাও* অবস্থান করে স্বতঃস্ফুর্ত অকর্মে।
> যদি শাসক এবং রাজারা একে বজায় রাখতে পারে,
> তারা বিপুল সংখ্যক সত্তা তাদের নিজেদের কর্তৃক রূপান্তরিত হবে
> (Kohn 2004, 20)।

অবিচ্ছিন্নতাবোধ জাপানি বুদ্ধ মতবাদে দৃষ্টিগোচর হয় সচেতন এবং অ-সচেতন সত্তার মধ্যকার বাহ্য পার্থক্য দূরীকরণের জন্য। *ধর্মকায়ার* (*dharmakaya*) সাথে অবিচ্ছিন্নতাবোধ বোধিসত্ত্ব অর্জন করতে পারে। এইভাবে আমরা দেখেছি যে অবিচ্ছিন্নতাবোধের মূল্য উভয় ধারায় বিদ্যমান। আত্মবিমুখ অবিচ্ছিন্নতাবোধ এবং কারো নিজের আত্ম-সংরক্ষণের দ্বারা অবিচ্ছিন্নতাবোধ পাশ্চাত্য এবং এশীয় ধারায় স্থান করে নিয়েছে।

উপসংহার

পরিবেশ দর্শন তুলে ধরে যে বাস্তুতান্ত্রিক সংকট মূলত অধিবিদ্যক এবং, তাই, একটি আত্ম-প্রকৃতি অধিবিদ্যক দর্শন প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মাধ্যমে, আমি সাধারণ মূল্যসমূহকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। যে কোন সংস্কৃতিই মূল্যের একটি উৎস কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করার জন্য দরকার তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া, যত্ন নেওয়া, এবং বিবেচনা করা। তথাপি, এটি সম্ভব যে কিছু মূল্য পরস্পর বিরোধী এবং অন্য সাংস্কৃতিক মূল্যের সাথে বিরোধপূর্ণ। এমনকি একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্বেও সেগুলো অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু, এমন কিছু মূল্য রয়েছে যা সকল মানব সমাজেই সাধারণ। তার উপর শুধুমাত্র বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা যথার্থ হতে পারে না। মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক ইতিহাস-পূর্ব; যদিও নতুন জ্ঞান সময়ে সময়ে একে আকার এবং পুনরাকার দিয়েছে। আমাদের বর্তমান আচরণ এবং প্রবণতা, যেটি অশুদ্ধ আত্ম-প্রকৃতি অধিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটিই মূলত বাস্তুবিদ্যক সংকটের জন্য দায়ী। আমার মতে, এই ত্রুটিপূর্ণ আত্ম-প্রকৃতি সম্পর্কের একটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে মৌলিক মূল্যবোধকে চিহ্নিত করা। এই মূল্যসমূহ আমাদের প্রকৃতির প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এবং অ-মানব সত্তার সাথে একটি

সংগতিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। আমি মনে করি যে, আমাদের প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে হয়তো নতুন কোন মূল্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে না কিন্তু যা প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে সাধারণ প্রাচীন মূল্যবোধে ফিরে আসা। অবিচ্ছিন্নতাবোধ আমি যেভাবে আলোচনা করেছি, তা প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় সাংস্কৃতিক ধারায় বিভিন্নরূপে বিদ্যমান। আমাদের উচিত প্রকৃতির প্রতি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার জন্য মৌলিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া, যত্ন নেওয়া, এবং এগুলোকে বিবেচনা করা। কিন্তু এই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি কি আত্মত্যাগ দাবী করে? যদি তাই হয়, কতটুকু? সর্বনিম্ন? সর্বোচ্চ? নিশ্চিতভাবেই এগুলো পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রশ্ন।

References

Attfield, Robin. 1983. "Western Traditions and Environmental Ethics". In *Environmental Philosophy: A Collection of Readings*, eds. Robert Elliot and Arran Gare, 201–230. University Park: The Pennsylvania State University Press.

Banerjee, Akshaya Kumar. 1967. *Discourses On Hindu Spiritual Culture*. New Delhi: S. Chand & Co.

Banerjee, Brojendra Nath. 1979. *Hindu Culture Custom and Ceremony*. Delhi: Agam Kala Prakashan.

Callicott, J. Baird. 1987. "Conceptual Resources for Environmental Ethics in Asian Traditions of Thought: A Propaedeutic." *Philosophy East and West* 37(2): 115–130.

—. 1994. *Earth's Insights: A Survey of Ecological ethics From the Mediterranean Basin to the Australian Outback*. California: University of California Press.

Des Jardins, Joseph. E. 1997. *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

De Bary, Wm. Theodore, Wing-tsit Chan, and Burton Watson, eds. 1960. *Sources of Chinese Tradition*, Vol. 1. New York: Columbia University Press.

Fang, Thome H. 1973. "A Philosophical Glimpse of Man and Nature in Chinese Culture." *Journal of Chinese Philosophy* 1(1) : 3–26.

"Genesis". 2008. *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, eds. Louis P. Pojman, Paul Pojman, 12–14. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Gosling, David L. 2001. *Religion and Ecology in India and Southeast Asia*. London: Routledge.

Hargrove, Eugene C. 1989. *Forward to Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy*, eds. J. Baird Callicott and Roger T. Ames, xiii-xxi. Albany: State University of New York Press.

Houle, K.L.F.1997. "Spinoza and Ecology." *Environmental Ethics* 19(4): 417–432.

Hughes, J. Donald. 2009. "Environmental Philosophy: Ancient Philosophy". In *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy*, eds. J. Baird Callicott and Robert Frodeman, 355–359. MI: Macmillan Reference USA.

Kohn, Livia. 2004. *Daoism and Chinese Culture*. Cambridge, Massachusetts: Three Pines Press.

Lamb, Ramdas. "Sacred". 2008. In *Studying Hinduism: Key Concepts and Methods*, eds. Sushil Mittal and Gene Thursby, 339–353. New York: Routledge.

Mill, John Stuart. "Nature." 2008. *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, eds. Louis P. Pojman and Paul Pojman, 123–131. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Miller, James. 2003. *Daoism: A Short Introduction*. Oxford: One world Publications.

Mohanty, Jitendra Nath. 1992. *Reason and Tradition in Indian Thought: An Essay On the Nature of Indian Philosophical Thinking*. New York: Oxford University Press.

Naess, Arne. 1995. "The Deep Ecology 'Eight Points' Revisited." *Deep Ecology for the Twenty-First Century*, edited by George Sessions, 213–221. Boston: Shambhala.

—. (1986a) 1995. "Self-realization: An Ecological Approach to Being in the World." In *Deep Ecology for the Twenty-First Century*, edited by George Sessions, 225–239. Boston: Shambhala Publications.

—. (2008). "Ecosophy T: Deep Versus Shallow Ecology." *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*, eds. Louis P. Pojman and Paul Pojman, 219–228. CA: Thomson Wadsworth.

Nelson, Lance E. 2008. "Ecology." In *Studying Hinduism: Key Concepts and Methods*, eds. Sushil Mittal and Gene Thursby, 97–111. New York: Routledge.

Neville, Robert Cummings. 2008. *Ritual and Deference: Extending Chinese Philosophy in a Comparative Context*. Albany: State University of New York Press.

Passmore, John. 1980. *Man's Responsibility for Nature: Ethical Problems and Western Traditions*. London: Duckworth.

Pojman, Louis P., and Paul Pojman, eds. 2008. *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application*. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Pratt, Vernon. 2008. "Environmental Philosophy: Early Modern Philosophy." In *Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy*, eds. J. Baird Callicott and Robert Frodeman, 362–367. MI: Macmillan Reference USA.

Rolston III, Holmes. 1987. "Can the East Help the West to Value Nature?." *Philosophy East and West* 37(2):172–190.

Shah, Giriraj. 1982. *Indian Heritage*. New Delhi: Abhinav Publications.

Ten, C. L. 1991. "Mill's Defence of Liberty". In *J.S. Mill On Liberty in Focus*, eds. John Gray and G.W. Smith, 212–238. New York: Routledge.

Weiming, Tu. 1998. "The Continuity of Being: Chinese Vision of Nature." In *Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans*, eds. Mary Evelyn Tucker and Jogn Berthrong, 105–121.Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

White, Lynn. 2008. "The Historical Roots of Our Ecological Crisis." In *Environmental Ethics: Readings in Theory and Application,* eds. Louis P. Pojman and Paul Pojman, 14–21. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

[**Translator's Introduction :** "Self, Nature, and Cultural Values" authored by Md. Munir Hossain Talukder was first published in January 2010 from Romania as a journal article in the second volume of *CULTURA: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*. Soon after the publication, an Italian poet translated it into Italian as UNA NUOVA "FILOSOFIA" AMBIENTALE *Occorre ripensare il rapporto fra se e natura basandosi su valori culturali comuni* [A New Environmental "Philosophy"]. Then it was published in Italian cultural journal PROMETEO by renowned publisher Mondadori, Milan, Italy in 2012. In 2015, this article was extensively cited in a thesis named as "Resilient landscape, resilient culture". This was a part of master's program in Sustainable Urban Planning at Blekinge Institute of technology, Karlscrona in Sweden. Later an abstract of this article translated into Turkish has been published. In 2018, Cambridge Scholars Publishing, UK published a book of this author named as *Nature and Life: Essays on Deep Ecology and Applied Ethics*. The article has been incorporated as third chapter in this book. Self, environment, nature, culture as well as the deeper realization of the interrelation between human and life placed the author in the array of the famous contemporary philosophers. Having recognized Professor Munir as an environmental philosopher, a deep ecologist and a cultural theorist, International academic arena cordially received his outstanding contribution. As it is reflected in the preface of that book Emeritus Professor Holmes Rolston III's statement, "Munir Talukder is an environmental philosopher in Bangladesh. Bangladesh is commonly regarded as one of the lesser developing nations, with many in poverty, so those of us in the developed West might not expect an environmental philosopher from that nation to be a deep ecologist. Munir Talukder comes as something of a surprise. But here he is" (preface, p.vii, 2018). It is worth noting here that Rolston III is often called the father of environmental philosophy and ethics. On another important concern, author's keen observation regarding multiculturalism has compelled him to be concerned about the people and culture living beyond the

state-ascertained geographic boundary. This in turn led him to propose his theory "Geo-Cultural Identity" as a solution to the limitations of multiculturalism. Meanwhile, this theory has been established as a distinct research field both in the East and the West. In 2015, the theory became the basis for a Ph.D. in the study of music from Laval University, Canada, under the title of 'Country Music's "Hurtin' Albertan": Corb Lund and the Construction of "Geo-Cultural" Identity'. Given the fact that it is a fortune for Bangladesh that her womb conceives such scholar and philosopher like a few others whose contribution sparkles the light globally, I feel that the national need for, and interest in, the translation of these works published in foreign languages into our beloved mother language, is pressing. Therefore, this translation is an attempt to fulfill the national expectation within my ability. Of course, forgiveness is requested humbly for any unintentional errors made in this translation.]